মহাজীবনের অখণ্ড-অনন্তধারায়

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বহু সহস্র বৎসর বয়োধারী অমর পুরুষ কৈলাস-বিহারী শ্রীশ্রীবাবাজীমহারাজ, যিনি সর্বকালের সর্বযুগের লীলার পশ্চাতে রয়েছেন, তৎশিষ্য শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের অসীম অনুকম্পায় ত্বদীয় শিষ্য স্বামী প্রণবানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে যখন সেই শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন শ্রীশ্রীবাবাজীর সহিত প্রণবানন্দের যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের তৎকালীন বয়স ছিল চার কল্প চলমান। প্রণবানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ''কল্প কত বৎসর?'' বাবাজী বলিয়াছিলেন, ''কলিতে মানুষের পূর্ণমাত্রা আয়ু ১২০ বৎসর। তাহারই নাম কল্প। সেই এক কল্পে মানুষ বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য অবস্থা পর্য্যন্ত ভোগ করে সাধনা দ্বারা বেঁচে থাকলে তার দ্বিতীয় কল্পে আবার যৌবন আসে এবং সেই যৌবনেরই জোয়ার-ভাঁটা হয় মাত্র, বার্দ্ধক্য আর আসে না। এমনি করে কল্পের পর কল্প যেতে আসতে থাকে। আমার তিন কল্প চলে গিয়ে চার কল্প প্রায় পূর্ণ হতে চলল।'' প্রণবানন্দ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''ইচ্ছা করলেই কি বেঁচে থাকা যায়?'' বাবাজী বলিলেন, ''যায়। সাধনা চাই।'' প্রণবানন্দ বলিলেন, ''এই রকমে কত দিন বেঁচে থাকবেন?'' বাবাজী উত্তর করিলেন,''মনে ইচ্ছা ছিল কল্কিকে উপদেশ করে শরীর ত্যাগ করবো।''.....

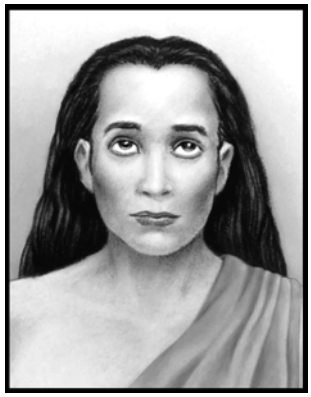

শ্রীশ্রীবাবাজীমহারাজ

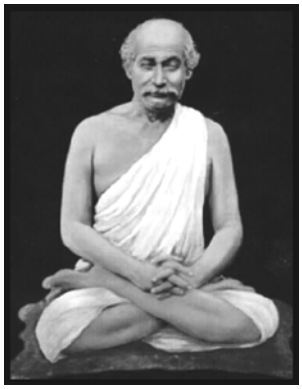

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়

কল্কিপুরাণ অনুযায়ী ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার ''কল্কি'' যথাসময়ে উপনীত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ গুরু গৃহে গমন করেন। কিছুকাল পরে তিনি মহেন্দ্র পর্বতে ''পরশুরামের'' নিকট চতুঃষষ্টি কলার সহিত বেদবেদাঙ্গ ও ধনুর্বেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নান্তে তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে ব্রহ্মর্ষি পরশুরাম বলিলেন, ''তুমি সিংহল দ্বীপে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণ পূর্বক সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করিবে। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্মবর্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাস্ত করিয়া অধর্মচারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিবে এবং দেবাপি ও মরু নামক ধার্মিকদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।'' গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কল্কি ম্লেচ্ছ ও বিধর্মীদিগকে বিনাশ করিয়া সনাতন ধর্মসংস্থাপন পূর্বক সহস্র বৎসর রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া দেবগণের প্রার্থনায় পুনঃ বিষ্ণুলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান পরশুরামরূপে মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজই কল্কিকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দ গিরি মহারাজ

বিংশ শতাব্দীতে চুচূড়ার যোগীরাজ শ্রীশ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ইং ১৯১১ সালে কৈলাস-বিহারী শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিকট তাঁহার দীক্ষালাভ হয়। মাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের গুরুদীক্ষার ঘটনাটি বড়ই অদ্ভুত। প্রথমে মাণিকলাল শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) নিকট দীক্ষালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সবিনয়ে অন্তরস্থ বাসনা তাঁহাকে নিবেদন করিলে 'গন্ধবাবা' মাণিকলালকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বলিলেন, ''আমি তোমায় দীক্ষা দেব না। তোমার দীক্ষার জন্য এক মহাপুরুষ নির্দিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি নির্দ্ধারিত দিনে ও ক্ষণে আবির্ভূত হইবেন। অতঃপর মাণিকলাল গন্ধবাবার অমরবাণী অন্তরে ধারণ করিয়া অজানা এক মহাপুরুষের কৃপার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেন। এই সময় তিনি কানু জংশনে ভূতনাথ নামক বন্ধুর বাটীতে অবস্থান করিতেন। প্রায় প্রত্যহ একা বৈকালে তিনি কানু জংশনের সংলগ্ন নির্জন মাঠে বেড়াইতেন। এইরূপ এক বৈকালে নিকটস্থ এক বটবৃক্ষের পাদদেশে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী কিঞ্চিৎ শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মুখমণ্ডল সৌম্য, শান্ত, সুকুমার কান্তি অথচ উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (বয়স অনুমান ১৯-২০) এক মহাপুরুষের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আহ্বানে মাণিকলাল আকৃষ্ট হইলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, ''মাণিকলাল, তুমি এখানে এস, আমি তোমায় ডেকেছি।'' সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি কিভাবে তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন, এই চিন্তা মুহূর্তের জন্য মাণিকলালকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেও কিন্তু অবিলম্বে সেই চিন্তার জাল ছিন্ন করিয়া তিনি সেই অপরিচিত মহাপুরুষের নিকট বটবৃক্ষতলে উপনীত হন। তিনি সমীপবর্তী হইলে মহাপুরুষ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, ''আমি তোমায় দীক্ষা দিতে আসিয়াছি; কল্য প্রাতে দীক্ষা দিব। স্নানান্তে একখানি নূতন আসন ও হরিতকী সঙ্গে করিয়া আনিবে না হয় তাও দরকার নাই।'' এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর মন্ত্রমুগ্ধের মত মাণিকলাল তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলেন। প্রণামান্তে যখন উঠিলেন তখন দেখিলেন যে দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছেন।

ভাবীকালের সম্ভাবনার আনন্দঘন অনুভূতিতে শুভ রাত্রি সত্বর অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে নবচেলীর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসন ও হরিতকী হস্তে মাণিকলাল উদ্বেলিত অন্তরে মহাপুরুষ নির্দেশিত বটবৃক্ষমূলে একাকী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পূর্বদিনের সেই সুচারুদর্শন দীপ্তিমান দৈবপুরুষ পূর্ব হইতেই তথায় উপস্থিত হইয়া আছেন। মাণিকলাল উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে সম্মুখে আসন পাতিয়া বসিবার নির্দেশ দিলেন। মাণিকলাল আসনে বসিলে পরে সেই মহাপুরুষ তাঁহার দৈব দক্ষিণ হস্তটি মাণিকলালের মস্তকের ব্রহ্মতালুদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, ''এই আমি তোমায় দীক্ষা দিলাম।'' দীক্ষান্তে মাণিকলাল আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাত্মার শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত তাঁহার আশ্রমে যাইবার বাসনা

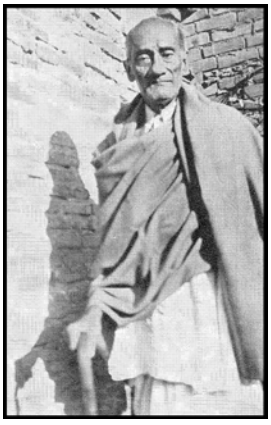
শ্রীশ্রীমাণিকলাল দত্ত

প্রকাশ করিলে মহাত্মা তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি এই বলিয়া মাণিকলালকে বিরত করিলেন যে, ''সংসারে তোমায় থাকিতে হইবে, কাজ আছে; বিশ্বের ত্রিতাপ তাপিত নরনারী ঈশ্বরের সত্ত্বা ও অস্তিত্ব সন্ধানে তোমার নিকটে আসিবে, সময়ে তোমার কার্য্যক্রম উপলব্ধি হইবে। নিজ যোগ্যতার উপর সন্দিহান হইও না। দৈবের নিকট সবই সম্ভব।'' পরে মাণিকলাল তাঁহাকে বলিলেন যে, ''আমি আপনার নিবাস জানি না, আমার নিবাস সম্বন্ধেও আপনি অবগত নহেন — এমত অবস্থায় ভবিষ্যতে কিভাবে আপনার দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিব?'' ইহাতে সেই জ্যোতির্ময় দিব্য মহাপুরুষ বলিলেন যে, ''বাসস্থান আমার জানা আছে, আর আমার বাসস্থান তোমার পক্ষে জানা অসম্ভব। আমি আকাশ পথে আসিয়াছি। তুমি ডাকিলে আমি আসিব, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কদাচ ডাকিও না; বরং প্রয়োজন বোধে আমিই ভবিষ্যতে তোমায় দর্শন দিব।'' তিনি একথাও ব্যক্ত করিলেন যে, ''তুমি যে কানু জংশনে আসিয়াছ ও ভূতনাথ বাবুর আলয়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছ, এই সবই আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে।'' সংসারে বাস করার যন্ত্রণা ও বহুমুখী অসুবিধার বিষয় তাহার গুরুর নিকট ব্যক্ত করিলে গুরু তাহাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করিলেন যে, ''সাংসারিক জীবনে তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তাহা চিন্তা মাত্রই দশ হাতের ব্যবধানেই তাহা পাইবে।'' অনন্তর মাণিকলাল পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বিদায় ভিক্ষা জানাইতে গেলে দেখিলেন যে মহাপুরুষ পূর্বদিনের মতই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে মাণিকলাল তাঁহার পরমপূজ্য গুরুদেবকে তিনি ''বাবাজী মহারাজ'' বা ''কৈলাসপতি'' বলিতেন। তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইবার জন্য ভক্তেরা মাণিকলালকে পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিতেন যে তাহার উপলব্ধিতে যতটুকু দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছে তাহাতে, তাহা হইল যে, ''বাবাজী মহারাজ'' চার যুগের অমরত্বের অধিকারী ত্রিকালজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ী ''পরশুরাম'' স্বয়ং — (উক্ত ঘটনাবলী ''জীবনাভাস'' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত এই পুস্তকটি শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের ভক্তমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।)

মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের মহাজীবনের অখণ্ড অনন্তধারায় আত্মোপলব্ধির দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখিতে পাই যে জীবাবস্থা হইতে শিবাবস্থায় উপনীত হইবার তপোলব্ধ ধারায় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের অবদান অতুলনীয়। প্রথমতঃ মহাপ্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র মহামুনি কপিল রূপে আত্ম-সাধনার মাধ্যমে ধ্যানযোগে সৃষ্টিতত্ত্বের যে নিগুঢ় তত্ত্বকে জ্ঞাত হইয়া তিনি ''সাংখ্য-দর্শন'' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যে দর্শনের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব সুবিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছিল উপলব্ধিত সত্যের দর্শনাকারে প্রকাশরূপ মাত্র। মহামুনি কপিলের পরে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার তপস্যা, সাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের মাধ্যমে অতিবৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক যোগকৌশল সম্বলিত আত্ম-সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সাপেক্ষ ''পাতঞ্জল যোগ-দর্শন'' নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মাধ্যমে আমরা জীবাবস্থা হইতে শিবাবস্থায় মনুষ্য চেতনার রূপান্তরের ক্রমিক আত্মবোধের অভ্যুদয়ের বিষয়ে অবগত হইতে পারি। অতিবিজ্ঞান ভিত্তিক হইলেও ''পাতঞ্জল যোগ-দর্শন'' তত্ত্ব কেন্দ্রিক উপলব্ধিত আত্মযোগ-তত্ত্বমূলক আত্ম-বিজ্ঞান সম্মত একটি দর্শন বিশেষ। কপিলের ''সাংখ্য দর্শন'' সাংখ্যযোগে রূপান্তরিত হইল শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়। তৎসঙ্গে পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও কর্মকৌশলরূপে আধ্যাত্মিক মার্গে যোগীগণের ব্যবহারিক বিষয় হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার রূপ পরিগ্রহ করিল ঐ শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়ই। এই ব্রহ্মবিদ্যাই ক্রিয়াযোগরূপে স্ফুরিত হইল ভগবান পরশুরামের মাধ্যমে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রথী-মহারথীগণের মধ্যে। অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয় এই জন্যে যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধরূপ মহাভারতের ভগবৎলীলায় যোগতত্ত্বরূপ আত্মবিদ্যার সত্যস্বরূপের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। — এইভাবে মহাজীবনের ধারায় তিন অধ্যায়ে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহার সাধনারূপ সত্য দর্শনকে তত্ত্বমূলক, গবেষণামূলক ও কর্মমূলকে রূপান্তরিত করিয়া যুগ-যুগান্ত ব্যাপী তপস্যার মহাবলে মহাবতার মহারাজ জীব কল্যাণার্থ কর্মে এবং সনাতন ধর্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠাকে কায়েম রাখিয়া চলিয়াছেন। জীব-জগতে তাঁহার এই নিঃস্বার্থ অবদানের জন্যে জানাই সেই পরম মহাত্মনের প্রতি আমার অনন্ত শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

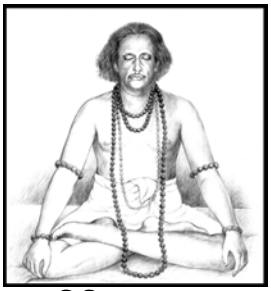
শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

আমি আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীসরোজ বাবার শ্রীমুখে

শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে তাঁহার দেহের বয়স জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে, ''ম্যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখা হুঁ।'' — ইহা হইতেও দৃঢ় প্রতীত হয় যে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ও ভগবান পরশুরামের ব্যক্তিত্ব এক ও অভিন্ন।

কালান্তরে সময়ের অগ্রগতিতে যুগের বিশেষ প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্মের গ্লানি এবং অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় রোধ করিতে আসিলেন শিবাবতার ''আচার্য্য শংকর''। এই শিবাবতারের অবতরণের নেপথ্যে যাঁহার ইচ্ছা ও সাধনা ছিল তিনি হইলেন আদি শংকরাচার্য্যের সদ্‌গুরু শ্রীমদ্ গোবিন্দপাদ। প্রজ্ঞার আলোকে জানা যায় যে সদ্‌গুরু গোবিন্দপাদই হইলেন পতঞ্জলিদেব স্বয়ং যিনি হইলেন ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের নব কলেবরে আবির্ভাব।

ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পতঞ্জলির ভাবে শ্রীগোবিন্দপাদ রূপে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব রূপী মহাগুরু শ্রীমদ্‌গৌড়পাদকে সঙ্গে লইয়া সনাতন ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করিতে এবং অধর্মকে বিনাশ করিতে বশিষ্ঠ পুত্র শিবাংশ সম্ভূত পূর্ণ শিবকল্প মহর্ষি শক্তিকে, শিবাবতার ''শংকরাচার্য্য'' রূপে পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ করাইলেন। ঐ ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারই যে হইলেন মহাবতার কৈলাসবিহারী বাবাজী মহারাজের আদি সত্তা, আদি দেহ ও আদি স্বরূপ ইহা নিঃসংশয়; ইহা প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাগণেরা অবগত আছেন।

জয় সনৎকুমারর জয়।। জয় কপিলেশ্বরের জয়।।
জয় মহর্ষি পতঞ্জলির জয়।। জয় ভগবান পরশুরামের জয়।।
জয় ভগবান বুদ্ধের জয়।। জয় শ্রীমদ্ গোবিন্দপাদের জয়।।
জয় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জয়।।

(সহায়ক গ্রন্থাদি : কল্কিপুরাণ, প্রণবগীতা, জীবনাভাস ও শংকরাচার্য্যের জীবনীগ্রন্থ)